দাওয়াতের নববী উসূল

হযরত সৈয়দ সোলাইমান নদভী রহঃ

হযরত ইলিয়াস (রহঃ) ও তাঁর দ্বীনী দাওয়াত– গ্রন্থের ভূমিকা স্বরুপ লিখিত
দাওয়াতের নববী পন্থা, এর প্রকৃতি ও দায়ীদের সিফতের উপর
হযরত সৈয়দ সোলাইমান নদভী (রহঃ) এর একটি প্রামাণ্য
আলোচনা, যা দাওয়াতের মেহনতকারী সাথী ভাইদের
জন্য অত্যন্ত উপকারী ও অবশ্য পাঠ্য।

'মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস ও তাঁর দ্বীনী দাওয়াত' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপার কাজ যখন প্রায় শেষ তখন সৈয়দ সাহেবকে একটি পরিচিতি-ভূমিকা লেখার অনুরোধ করা হল। নীচের প্রবন্ধটি সে অনুরোধেরই ফসল। তবে গ্রন্থ-ভূমিকা হিসেবে লেখা হলেও উপযোগিতার দিক থেকে এ লেখা অবশ্যই স্বতন্ত্র প্রবন্ধের স্বকীয় মর্যাদারও অধিকারী। সুপ্রিয় পাঠক ও দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতে নিবেদিত সাথী বন্ধুরা যদি গভীর চিন্তামনস্কতার সাথে এ লেখা পড়েন তাহলে তারা অত্যন্ত কল্যাণপ্রসূ ও অন্তর্জ্ঞান প্রসারী দিকনির্দেশনা পাবেন আশা করি।

- মুহাম্মদ মনযূর নোমানী

দাওয়াতের নববী উসূল

হযরত সৈয়দ সোলাইমান নদভী রহঃ

ইসলাম এক ঐশী জীবনবিধান আর মুসলিম উম্মাহ হল সে জীবনবিধানের ধারক, বাহক। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, মুসলিম জনসাধারণই শুধু নয় বরং ওলামা ও মাশায়েখগণ পর্যন্ত অবহেলা উদাসীনতায় এ মহাসত্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে পড়েছেন। ফলে মুসলমানরাও আজ পৃথিবীর অপরাপর জনগোষ্ঠীর জাতিস্বত্তার সংজ্ঞা অনুসারে নিজেদেরকে নিছক একটি জাতি রূপে ধারণা করে থাকে।

- একদল তাদের জাতীয়স্বত্তার সৌধ নির্মাণ করেছে ভৌগলিক সীমারেখার উপর।
- আর অন্য দল ভাষা, বর্ণ বা রক্ত বৈশিষ্ট্যের উপর।
- মুসলিম সমাজে যাদের কিছুটা বোধ ও বুদ্ধি আছে তারা খুব বেশী হলে এই মনে করেন যে, মুসলমানদের জাতিস্বত্তা অঞ্চল ও ভাষাভিত্তিক নয় বরং এক ধর্মভিত্তিক।

অথচ প্রকৃত সত্য তাদেরও চিন্তা-রেখার বহু উর্ধ্বে। আর তা এই যে - মুসলমান হল পৃথিবীর বুকে আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ হতে এক বিশেষ পয়গাম বহনকারী জামাআত, যাদের একমাত্র জীবন-কর্তব্য হল এ পয়গামকে রক্ষা করা এবং সার্বজনীন দাওয়াতের মাধ্যমে মানব সমাজে এর প্রসার ঘটানো। এ পয়গাম ও জীবনবিধান গ্রহণকারীরা ভাষা বর্ণ ও ভৌগলিকতার উর্ধ্বে সুনির্দিষ্ট দায়দায়িত্ব সম্পন্ন এক বৃহৎ পরিবারভুক্ত। এ পরিবার-বন্ধনই হল তাদের জাতীয়তা এবং এখানেই মুসলিম জাতীয় স্বত্তার স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য।

এ পরম সত্য অনুধাবণের পর মুসলিম উম্মাহর সর্বপ্রধান কর্তব্য হল-

- পূর্ণ জ্ঞান অর্জনপূর্বক এই আসমানী পয়গাম অনুসরণ করা
- তালীম ও দাওয়াতের মাধ্যমে এর প্রচার প্রসারে আত্মনিয়োগ করা এবং
- এর অনুসারীদের নিয়ে পূর্ণ দায়দায়িত্বমূলক একটি সার্বজনীন ভ্রাতৃ-পরিবার গঠন করা।

কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, মাত্র এক শতাব্দীর সময় ব্যবধানেই মুসলিম উম্মাহ তাদের এই জাতীয় দায়িত্ব বিলকুল ভুলে গিয়েছিল।

- আমাদের শাসকবর্গ দেশ জয় ও দেশ শাসনে তুষ্ট ছিলেন এবং রাজস্ব-সম্পদের স্রোতে গা ভাসানো এবং বিলাশ জৌলুস ভোগ করাকেই জীবনের সার্থকতা ভেবে বসেছিলেন।
- আলিম ওলামা ও জ্ঞানসেবীগণ পঠন-পাঠন ও নিবিষ্ট অধ্যয়নেই পরিতৃপ্ত ছিলেন। দায়মুক্ত নির্ঝঞ্ঝাট জীবনই ছিল তাদের কাম্য।
- অন্যদিকে মাশায়েখ ও সূফী দরবেশগণ খানকার ভাবগম্ভীর পরিবেশেই আত্মসমাহিত ছিলেন। জীবনের কোলাহল ও জীন্দেগীর তুফান থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখাই ছিলো তাদের উদ্দেশ্য।

ফল এই দাঁড়াল যে, নেতৃত্ব ও পথ নির্দেশনাহীন মুসলিম উম্মাহ তার নিজস্ব অবস্থা ও অবস্থান সম্পর্কে গাফেল ও বেখবর হয়ে গেল এবং সকল শ্রেণীর দৃষ্টিপথ থেকে তাদের জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হারিয়ে গেল।

মুসলিম উম্মাহর দায়িত্বঃ

কুরআন সুন্নাহর প্রত্যক্ষ বাণী ও নির্দেশ থেকে এটা সুপ্রমাণিত যে, মুসলিম উম্মাহ তাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুবর্তিতায় –

- বিশ্বের সকল জাতির কল্যাণ ও হিদায়াতের উদ্দ্যেশেই প্রেরিত এবং
- বিশ্বসভায় ‘আমর বিল মারুফ ও নাহী আনিল মুনকার’ এর সুমহান দাওয়াতী দায়িত্ব পালনের জন্যি উত্থিত।

তাই আল-কুরআন পরিষ্কার ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করছে – **"তোমরা হলে শ্রেষ্ঠ উম্মাহ, যাদের অস্তিত্ব দান করা হয়েছে মানুষের (কল্যাণের) জন্য। তোমরা সৎ কাজে উদ্বুদ্ধ করবে এবং মন্দ কাজ হতে নিবৃত্ত করবে।"** – *সূরা আল ইমরান, আয়াত ১১০।*

আলোচ্য আয়াতের বাণী নির্যাস এই যে,

- বিশ্ব জাতিবর্গের কল্যাণ স্বার্থেই মুসলিম উম্মাহর আবির্ভাব ঘটেছে।
- পৃথিবীর বুকে কল্যাণ ও সুকৃতির প্রসার এবং অকল্যাণ ও কুকৃতির প্রতিরোধের মাধ্যমে বিশ্ব মানবতার সেবা করে যাওয়াই তার অস্তিত্ব লাভের মূল উদ্দেশ্য।

এ উদ্দেশ্যের প্রতি মুসলিম উম্মাহ যদি অবহেলা বা শৈথিল্য প্রদর্শন করে তবে সে তার জীবন-লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ প্রমাণিত হবে এবং অস্তিত্বের যৌক্তিকতাই প্রশ্নের সম্মুখীন হবে। এর কয়েক আয়াত উপরে সুস্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে যে, দাওয়াত ও তাবলীগের এ আসমানী দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়া প্রত্যেক যুগের (প্রত্যেক অঞ্চলের) মুসলমানদের উপর ফরযে কিফায়া। অর্থাৎ পর্যাপ্ত পরিমাণ মুসলিম জামাআতকে এ কাজে অবশ্যই লেগে থাকতে হবে। যদি মুসলিম উম্মাহর সকলেই এ দায়িত্ব এড়িয়ে যায় তাহলে গোটা উম্মাহ দায়িত্ব বিচ্যূতির অপরাধে পাকড়াও হবে। পক্ষান্তরে পর্যাপ্ত সংখ্যক জামাআত এ কাজে নিয়োজিত থাকলে গোটা উম্মাহর পক্ষ হতে ফরয আদায় হয়ে যাবে। ইরশাদ হয়েছে- **"তোমাদের একটি জামাআত অবশ্যই এমন থাকা চাই; যারা কল্যাণের পথে ডাকে এবং সৎ কাজে উদ্বুদ্ধ করে এবং মন্দ কাজ হতে নিবৃত্ত করে আর এরাই হল সফলকাম।** - *আল ইমরান, আয়াত ১০৪।*

এখানে দাওয়াতি জামাআতকেই গোটা উম্মাহর কামিয়াবি ও সফলতার জিম্মাদার সাব্যস্ত করে তাদের মোট তিনটি কর্তব্য নির্দেশ করা হয়েছে। যথা-

- মুসলিম উম্মাহ তথা গোটা বিশ্বমানবতাকে কল্যাণের পথে আহ্বান
- সৎ কাজের প্রসার
- মন্দ কাজের প্রতিরোধ

মুসলিম উম্মাহার মাঝে এ মুবারক জামাআত যতদিন যে হারে বিদ্যমানা ছিল, ততদিন সে হারে দাওয়াত ও তাবলীগের এ গুরুত্বপূর্ণ ফরজ আদায় হয়ে এসেছে। কিন্তু খায়রুল কুরুন** বিষয়ক হাদীস অনুসারে সাহাবা, তাবেয়ীন, ও তাবে-তাবেয়ীন পরবর্তী যুগে ক্রমসংকোচনের ফলে দাওয়াতি মেহনত জামাত-পর্যায় থেকে ব্যক্তি পর্যায়ে নেমে এসেছিল।

** **আমার যুগ হল সর্বত্তোম যুগ, তারপর যারা এর সংলগ্ন, তারপর যারা এর সংলগ্ন।** -*সহীহ বুখারী, Volume 003, book 48, hadith 819*

রাজ্যক্ষমতা মূখ্য উদ্দেশ্য নয়ঃ

মূলত রাজ্য ও রাজস্বকে জীবনের চরম ও পরম মনে করার কারণেই এ পথে সবচেয়ে বড় গোমরাহীর অনুপ্রবেশ ঘটেছে এবং অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছে হাদীসে নববীর এ সতর্কবাণী- **আমি তোমাদের অভাব-দারিদ্র্য নিয়ে শংকিত নই। আমি বরং শংকিত (সমাগত ভবিষ্যতে) তোমাদের উপর দুনিয়ার ছড়াছড়ি নিয়ে।** - *সহীহ বুখারী, Volume 004, book 053, hadith 385*

মুসলমানদের উপর পৃথিবী যখন সম্পদ প্রাচুর্য ও ভোগ বিলাসের ছায়া বিস্তার করল তখন রাজ্য শাসন ও রাজস্ব গ্রহণকেই তারা নিজেদের জীবন-স্বার্থকতা বলে ধরে নিল এবং ইসলামের বিজয় ছেড়ে মুসলমানদের রাজ্য জয় নিয়েই

তুষ্ট হয়ে গেল। অর্থাৎ মুসলিম পরিচয়ধারী শাসকের দেশ শাসনকেই তারা পরম প্রাপ্তি মনে করে বসল। অথচ আসল উদ্দেশ্য তো ছিল-

- ইসলামী শরীয়ত ও ইসলামী সিয়াসতের ইনসাফপূর্ণ শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা এবং
- দেশ জয় ও শাসন ক্ষমতাকে এ পথের সর্বাধিক শক্তিশালী ও কার্যকর মাধ্যমরূপে ব্যবহার করা

এ ভাব বক্তব্যই এসেছে সামনের আয়াতে- **ঐ সমস্ত লোক যাদেরকে আমি শাসন ক্ষমতা দিলে তারা সালাত কায়েম করবে এবং যাকাত আদায় করবে এবং সৎ কাজের আদেশ করবে এবং মন্দ কাজ হতে নিবৃত্ত করবে। আর সর্বকর্মের পরিণতি আল্লাহ্‌রই অধিকারে।** - *সূরা হাজ্জ, আয়াত ৪১।*

মুসলিম উম্মাহ্‌ নবীর স্থলবর্তীঃ

নবুওয়তের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আমর বিল মারুফ ও নাহী আনিল মুনকারের ক্ষেত্রে মুসলিম উম্মাহ্‌ হল নবীর স্থলবর্তী। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে তিনটি নববী দায়িত্ব দান করা হয়েছে অর্থাৎ -

- আহ্‌কাম ও বিধানের পাঠদান
- কিতাব ও হিকমাহ্‌ শিক্ষাদান এবং
- আত্মসংশোধন

এগুলো মুসলিম উম্মাহ্‌র উপরও ফরযে কিফায়ারূপে অর্পিত হয়েছে এবং যুগে যুগে মুসলিম উম্মাহ্‌র বরণ্যে ইমামগণ পূর্ণ নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার সাথে এ তিন দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে এসেছেন। তাঁদেরই মেহনত মুজাহাদার নূরানী বরকতে জগত এখনও ইসলামের রোশনীতে ঝলমল। আলোচ্য ‘দায়িত্বত্রয়’ সামনের আয়াতে একত্রে বর্ণিত হয়েছে –
এবং তাদের মধ্য হতে একজন রাসূল যিনি তাদেরকে আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করে শোনাবেন এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমাহ্‌ শিক্ষাদান করবেন। - *সূরা জুমুআ, আয়াত ২।*

শিক্ষা ও দীক্ষার সমন্বয়ঃ

রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপরোক্ত ‘দায়িত্বত্রয়’ অত্যন্ত সুচারুরূপে আঞ্জাম দিয়েছেন-
- মানুষকে তিনি আল্লাহ্‌র তায়ালার আয়াত ও আহ্‌কাম শুনিয়েছেন এবং
- আসমানী কালাম ও রব্বানী হিকমাহ্‌ শিক্ষা দিয়েছেন।

কিন্তু এখানেই তিনি দায়িত্ব শেষ করেননি। বরং-

- আপন নূরানী সোহ্‌বত ও সংস্পর্শ দ্বারা এবং প্রজ্ঞাপূর্ণ হিদায়াত ও পথ নির্দেশনা দ্বারা হৃদয় ও আত্মার যাবতীয় কলুষ কালিমা থেকে তাদেরকে পবিত্রও করেছেন।
- কল্‌বের রোগ ব্যাধির সুচিকিৎসা করেছেন এবং পাপ পংকিলতা দূর করে মানব চরিত্রকে শিশির ধোয়া ফুলের সৌন্দর্য দান করেছেন।

এভাবে জাহেরী ও বাতেনী উভয় দায়িত্ব সমান গুরুত্বের সাথে যুগপৎ আঞ্জাম পেয়ে এসেছে। পরবর্তী তিন ‘কল্যাণযুগ’ (খায়রুল কুরুন) পর্যন্ত উভয় ধারার মিশ্র প্রবাহই বিদ্যমান ছিল। অর্থাৎ -

- যিনি উস্তাদ ছিলেন তিনিই শায়খ ছিলেন।
- যিনি দরসের মসনদ আলো করে বসতেন তিনিই নির্জন রাতের নিদ্রাপুরীতে যিকিরের জীবন-স্পন্দন জাগাতেন এবং অনুগামীদের তাযকিয়া ও আত্মসংশোধনের দায়িত্ব পালন করতেন।

মোটকথা, সাহাবা, তাবেয়ীন, তাবে-তাবেয়ীন – এই তিন কল্যাণযুগে উস্তাদ ও শায়খ তথা 'শিক্ষক ও দীক্ষক' এর বিভাজন মোটেই নজরে পড়ে না।

শিক্ষা ও দীক্ষার বিভাজনঃ

উম্মাহ্‌র জীবনে তারপর এমন একটা সময় শুরু হল-

- যখন জাহেরী ইলমের বিদগ্ধ জ্ঞানীগণ হয়ে পড়লেন বাতেনী জগতে 'শূন্যহৃদয়'।
- পক্ষান্তরে বাতেনী জগতের জীবন্ত হৃদয় পুরুষগণ জাহেরী ইলম থেকে হয়ে গেলেন অজ্ঞ-বঞ্চিত।

যুগ হতে যুগান্তরে জাহির ও বাতিনের এ ব্যবধান ক্রমশ বেড়েই চলল। শেষ পর্যন্ত 'শিক্ষার' জন্য মাদরাসার এবং 'দীক্ষার' জন্য খানকাহর পৃথক অস্তিত্ব দেখা দিল এবং মসজিদে নববীর এ মিশ্র আলোকধারার তাজাল্লী ও বিকিরণ মাদরাসা ও খানকাহর আলাদা ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়ল। ফল এই দাঁড়াল যে, মাদরাসা থেকে উলামায়ে দ্বীনের পরিবর্তে উলামায়ে দুনিয়া বের হতে লাগল। অন্যদিকে খানকাহর অধিবাসীরা ইলম ও শরীয়তের উচ্চমার্গীয় জ্ঞান-রহস্য থেকে অজ্ঞ বঞ্চিত থেকে গেল।

শিক্ষা ও দীক্ষার ঐক্যেই সফলতাঃ

অবশ্য কল্যাণ যুগোত্তর সময়েও কিছু ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্বের আবির্ভাবধারা অব্যাহত ছিল, যাদের মাঝে নূরে নবুওয়তের এ দুই বর্ণচ্ছটার একত্র প্রতিফলন ঘটেছিল। আর গভীর পর্যবেক্ষণে এটাই দেখা যায় যে, নূরে নবুওয়তের উভয় ধারার ধারক ছিলেন যারা, তাদের দ্বারাই ইসলাম উপকৃত হয়েছে এবং ইসলামী উম্মাহ ফয়েয হাছিল করেছে। ইমাম গাযালী রহঃ- এর সযত্ন পরিচর্যায় বুদ্ধিবৃত্তি ও শরীয়তে জ্ঞান যেমন সজীবতা লাভ করেছে তেমনি হাকীকত ও মারেফতের ইলমও তারই মাধ্যমে প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। হযরত শায়খ আবু নাজীব সোহরাওয়ার্দী শায়খে তরীকত যেমন ছিলেন তেমনি জগতবিখ্যাত নিজামিয়া মাদরাসার স্বনামধন্য অধ্যাপকও ছিলেন। আর হযরত শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী রহঃ- এর কথাতো বলাইবাহুল্য। একই সাথে বিদগ্ধ আলিম ও শায়খে তরীকত ছিলেন তিনি। এমনকি ইমাম বুখারী, ইবনে হাম্বল, সুফিয়ান সওরী প্রমুখ মুহাদ্দিস, যাহেরী ইলমের সাধকরূপেই যাদের সাধারণ পরিচিতি, তারাও জ্ঞান ও অন্তর্জ্ঞানের সার্বিকতার অধিকারী ছিলেন। মধ্যস্তরীয় আলিমদের মধ্যে আল্লামা ইবনে তায়মিয়া ও হাফেয ইবনে কাইয়িম রহঃ – কে অজ্ঞ লোকেরা বিশুষ্ক হৃদয় মনে করলেও তাদের জীবনচরিত কিন্তু আধ্যাত্মিকতার কল্যাণসুধায় পরিপূর্ণ। ইবনুল কাইয়িমের 'মানাযিলুস সালিকীন' ও অন্যান্য গ্রন্থ অধ্যয়ন করুন, সহজেই বুঝা যাবে যে, জৌলুস ও আত্মসৌন্দর্য উভয় সাজেই তিনি সজ্জিত ছিলেন।

ভারতবর্ষেও ঐ সকল মহাপুরুষের ব্যক্তিত্ব গুনেই ইসলামের আলো প্রসার লাভ করেছে যাদের মাঝে মাদরাসা ও খানকাহর গুণসার্বিকতা বিরাজমান ছিল। আর যেহেতু তারা নববী আদর্শের নিকটতর ছিলেন সেহেতু তাদের রুহানী ফয়েয ও বরকত দূর দূরান্ত পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে চলেছিল। দিল্লীর আকাশের নক্ষত্র শাহ্ আব্দুর রহীম রহঃ থেকে শুরু করে শাহ্ ইসমাঈল শহীদ রহঃ পর্যন্ত একে একে সবাইকে দেখুন; জ্ঞান ও অন্তর্জ্ঞানের অপূর্ব সম্মিলন দৃশ্যই আপনার চোখে পড়বে এবং বুদ্ধিবৃত্তিক ও আধ্যাত্মিক উভয় ক্ষেত্রে তাদের ফয়য-বরকতের নিগূঢ় তত্ত্ব ও ব্যাপ্তি পরিস্ফুট হবে।

- তালিমের মসনদে বসে তারা 'কিতাব ও হিকমাহ্' শিক্ষাদানের প্রদীপ্ত প্রকাশ ঘটাতেন
- আবার খানকাহর ভাবগম্ভীর পরিবেশে 'আত্মসংশোধনের' তাজাল্লী বিকিরণ করতেন।

পরবর্তীকালে যারা এ মহান উত্তরাধিকার ধারণ করেছিলেন তাদের পরিচয় বলার অপেক্ষা রাখে না। কেননা তাদের নূরাণী চেহারায় আজীবন সিজদার নিশানিতেই তাদের পরিচয়-বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান (সূরা আল ফাত্হ, আয়াত ২৯)। পৃথিবী তাদের দ্বারা যে আধ্যাত্মিক ফয়েয লাভ করেছে এবং দ্বীনী তাবলীগ ও আত্মসংশোধনের যে মহান খিদমত তাদের দ্বারা আঞ্জাম পেয়েছে তা থেকেও যাহির-বাতিন তথা জ্ঞান ও অন্তর্জ্ঞানের এ সার্বিকতাই প্রতিবিম্বিত হয়। আল্লাহর চিরন্তন বিধান হিসাবে আগামী পৃথিবীতেও দ্বীনের এ ফয়েয ও বরকত তাদেরই দ্বারা প্রসার লাভ করবে, যাদের ব্যক্তি সত্তায়

মাদরাসা ও খানকাহর উভয় স্রোত অভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হবে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে – **উভয় ‘জলধী’ কে তিনি দান করেছেন অভিন্ন প্রবাহ। -** *সূরা আর রহমান, আয়াত ১৯।*

- বস্তুতঃ বিনিদ্র রাতের অশ্রুধারায় চোখের জ্যোতি উজ্জ্বলতা পায়।
- আর মুখের ভাষা সজীব হয় যিকিরের ফল্গুধারায়।
- ইসলামের ইতিহাসে তাই দেখা যায়- যারা ছিলেন নিঝুম রাতের ইবাদতগুজার তারাই ছিলেন যুদ্ধদিনের সিপাহী শাহসওয়ার।

সুদীর্ঘ তেরশ বছরের জীবন-চরিত ভান্ডার এ দাবীর সত্যতাই প্রমাণ করে। হৃদয়ের উষ্ণতা ছাড়া মুখের মুখরতা কিংবা কলমের গতি-চঞ্চলতা মরিচীকার ছলনা মাত্র। ক্ষণিক ঝলমলানি যতই মুগ্ধতা আনুক, জীবন পিপাসার শীতলতার পরশ থেকে তা একেবারে বঞ্চিত।

নবুওয়তি ভাবধারাই উম্মতের জীবনধারাঃ

এটা অবধারিত সত্য যে, নবুওয়তের মেযাজ ও ভাবধারা থেকেই মুসলিম উম্মাহর প্রাণ ও জীবনধারা উৎসারিত হতে পারে। এর বিশেষ কারণ এই যে, প্রত্যেক জাতি ও জনগোষ্ঠির স্বকীয় ও নিজস্ব প্রকৃতি রয়েছে। কোন সংস্কার ও সংশোধন প্রয়াশ যতক্ষণ জাতীয় স্বভাব ও প্রকৃতির অনুকূল না হবে ততক্ষণ তা সজীবতা ও সফলতা পেতে পারে না। বর্তমান যুগে বিভিন্ন দল ইসলামী উম্মাহর সংস্কার ও সংশোধন প্রয়াসের দাবীদার। কিন্তু তাদের হাল অবস্থা কি? –

- একদল তো মনে করে বসল যে, মুহাম্মদী নবুওয়তের যামানা পুরোনো হয়ে গেছে। এখন নতুন যুগের নতুন সমাজ ও নতুন চাহিদার আলোকে স্থানীয় ও দেশীয় নতুন নবুওয়তের প্রয়োজন। এ (উদ্ভট) চিন্তাতাড়িত হয়ে তারা নয়া নবুওয়তের দাওয়াত দিল এবং যথারীতি ব্যর্থ হল। মিল্লাতে মুহাম্মদী থেকে তাদের সম্পর্ক কেটে গেল।
- আরেক দল মুহাম্মদী নবুওয়ত তো বহাল রাখল কিন্তু মুহাম্মদী ওয়াহীর নয়া ব্যাখ্যার প্রয়োজন অনুভব করল এবং হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা অস্বীকার করে কুরআন ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে আপন বুদ্ধিবৃত্তি ও যুগপ্রকৃতিকেই ‘নির্ধারক’ এর মর্যাদা দিল, যেন তারা এক নতুন কুরআনের দাবীদার। ফলে মিল্লাতে মুহাম্মদীর সাথে এ দলের সম্পর্ক কমজোর হয়ে গেল এবং ‘আল্লাহর কিতাবই আমাদের জন্য যথেষ্ট’ বলে কুরআনের নতুন নতুন ব্যাখ্যা এবং নামায, রোযা ও হজ্জের নতুন নতুন ধারনার মাধ্যমে এক নতুন শরীয়ত তৈরি হয়ে গেল।
- তৃতীয় একদল কিতাবুল্লাহ্ ও হাদীসে রাসুলুল্লাহ্কে স্বীকার করেও প্রতিটি আয়াত ও হাদীসকে নিজস্ব চিন্তা ও যুক্তির মাপকাঠিতে বিচার করতে চায়। ফলে মুজিযাকে তারা অস্বীকার করেছে। জান্নাত-জাহান্নামের হাকীকত উপেক্ষা করেছে এবং রিবা ও সুদের বৈধতা দাবী করে বসেছে। এমনিভাবে জীবনসংশ্লিষ্ট বহু বিষয়কে তারা দ্বীন ও শরীয়তের পরিবর্তে বুদ্ধি ও ‘প্রকৃতির নিয়ম’ দ্বারা নির্ধারণ করতে চেয়েছে। ফলে অনুগত মুমিন জামাআত না হয়ে তারা হয়েছে দ্বীনে মুহাম্মদীর বিকৃত ব্যাখ্যাকারী জামাআত।
- নতুন চিন্তার আরেকটি দলও আত্মপ্রকাশ করেছে। নবুওয়ত বা কুরআনের নবায়ন তাদের দাবী নয়। নামাজ, রোযা ও হজ্জের আধুনিক রূপায়ণও তাদের কাম্য নয়। কিন্তু এক নতুন ইমামত ও ধর্মীয় নেতৃত্বের অভিলাষী তারা, যার মাধ্যমে ইসলামের ‘নতুন ব্যবস্থা’ গড়ে উঠবে। ঈমান, কুফর, নিফাক ও আমীরের আনুগত্য সম্পর্কিত নতুন রূপরেখা তৈরি হবে এবং মুসলিম সমাজে ইউরোপীয় ‘ইজম’ধর্মী এক নতুন আন্দোলনের সূচনা ঘটবে। বিশেষত মুসলিম তরুন সম্প্রদায়ের মাঝে ইজমীয় উম্মাদনার সাহায্যে এই ‘ইসলামি ইজম’ ছড়িয়ে দেয়া হবে এবং কালাম ও ফিকাহ শাস্ত্রীয় বিষয়ে নতুন ইজতিহাদী ধারায় নিজস্ব সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। বর্তমান বিপ্লববাদী যুগে হয়ত বা এ দল অস্থির তরুন সমাজকে স্থির ও আশ্বস্ত করার ক্ষেত্রে সফল প্রমাণিত হবে এবং অর্থনীতি ও রাজনীতির চোরা পথে ইলহাদ তথা নাস্তিকতা ও ধর্মহীনতার যে ঢল নেমে আসছে তার মুকাবেলায় কার্যকর ঢাল হতে পারে। কিন্তু এই অভিনব চিন্তা ও পন্থা উম্মতের সর্বস্তরে গ্রহণ উপযোগী নয় (এবং নতুন ফেতনার সম্ভাবনা থেকেও মুক্ত নয়)। হয়ত বা আল্লাহ্ তায়ালা এরপর কোন সমাধানের উদ্ভব ঘটাবেন।

মোটকথা, উম্মতে মুহাম্মদীর মেযাজ ও স্বভাব প্রকৃতির অপরিহার্য দাবী এই যে - দা'ঈ, দাওয়াত ও দাওয়াতি তরিকা – এ তিনটি বিষয় পূর্ণাঙ্গভাবে নববী সুন্নত ও নববী তরীকা মুতাবেক হবে।

- আকৃতি ও প্রকৃতি উভয় ক্ষেত্রে দা'ঈ নিজেও হবেন মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিবিম্ব। এই প্রতিবিম্বন যত নিবিড় হবে দাওয়াতের প্রাণশক্তি ততই বৃদ্ধি পাবে।
- অতঃপর দাওয়াতও হবে নববী দাওয়াতের অভিন্ন প্রতিধ্বনি। অর্থাৎ দাওয়াত হবে খালেছ ঈমান, ইসলাম ও নেক আমালের।
- সর্বোপরি ইসলামের প্রথম দা'ঈ রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দাওয়াতি তরীকা গ্রহণ করেছিলেন সেটাই হবে আমাদের দাওয়াতি জীবনের তরীকা।

বলাবাহুল্য যে, এ তিনটি ক্ষেত্রে নবুওয়াত যুগের সাথে যত নিকট সাদৃশ্য বজায় থাকবে দাওয়াতের প্রাণশক্তি এবং প্রভাব ও বিস্তৃতিও সেই পরিমাণে হবে। লক্ষ্যচ্যুতি ও পদস্খলন হতে নিরাপদ থাকা এবং সিরাতুল মুস্তাকীমের পথে স্থির, অবিচল থাকাও তত সহজ হবে। যুগে যুগে যে সকল মহান সংস্কারকের সংস্কার-প্রচেষ্টাকে উম্মাহ সাদরে গ্রহণ করেছে তাদের জীবন ইতিহাসও উপরোল্লেখিত মূলতত্ত্বের সত্যতা প্রমাণ করে।

মোটকথা, দাওয়াতের কামিয়াবীর জন্য অপরিহার্য শর্ত এই যে, -

- ইলম ও আমাল, চিন্তা ও চেতনা, দাওয়াতি পথ ও পন্থা এবং রুচি ও মেযাজের ক্ষেত্রে দা'ঈ হবেন সকল নবী-রাসুল, বিশেষত শেষ নবী ও শ্রেষ্ঠ রাসুল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বিশেষ সম্পর্ক সূত্রে আবদ্ধ।
- ঈমানী বিশুদ্ধতা ও দৃশ্যগত আমালী পরিচ্ছন্নতার পাশাপাশি তার অন্তর্গত অবস্থাও হবে নবুওয়তি রূপ-প্রকৃতির অনুগামী।
- আল্লাহ্ প্রেম, আল্লাহ্‌ভীতি ও আল্লাহ্‌মূখী সম্পর্কের ভাব ও ভাবনায় তিনি হবেন বলীয়ান।
- আচার আচরণে নববী সুন্নত অনুসরণে তিনি হবেন স্বতঃস্ফূর্ত।
- আল্লাহ্‌রই জন্য হবে কারো প্রতি তার ক্রোধ ও ভালোবাসা এবং বিদ্বেষ ও অনুকম্পা।
- উম্মাহর প্রতি গভীর মমতা এবং মানবতার প্রতি উপচে পড়া দরদ হবে তার দাওয়াত ও সংস্কার প্রয়াসের চালিকা শক্তি এবং আম্বিয়া কেরামের বারংবার ঘোষিত মূলনীতি – **"আমার আজর ও প্রতিদান আল্লাহ্ ছাড়া কেউ দিতে পারে না।"** *(সূরা ইউনুস, আয়াত ৭২)* - অনুযায়ী আল্লাহ্ তায়ালার কাছে প্রতিদান লাভের প্রত্যাশা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকবে না।
- আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের পথে তিনি হবেন এমন নিবেদিত প্রাণ ও সমর্পিতচিত্ত যে, পদ ও পদবী, সম্পদ ও প্রাচুর্য এবং খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভের মোহ কিংবা আয়েসী জীবনের ভোগ বিলাসের হাতছানি কোন কিছু তার সংগ্রামমুখর ও বিপদসংকুল পথ চলার মুখে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে না।
- তার উঠা-বসা, চলা-ফেরা, বলা-কওয়া; মোটকথা জীবনের প্রতিটি গতি ও স্পন্দন হবে একমূখী ও এককেন্দ্রিক। - **আমার সালাত ও ইবাদত এবং আমার জীবন ও মৃত্যু সব আল্লহ্ রাব্বুল আ'লামীনের জন্য।** *সূরা আল আনআম, আয়াত ১৬২।*

<u>আমাদের আলোচিত ব্যক্তি – এ মাপকাঠিতে</u>

আগামী পৃষ্ঠাগুলিতে যে মহান দা'ঈ ও তার দাওয়াতি মেহনতের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে; আমার দু'চোখের সৌভাগ্য যে, আমি তাকে দেখতে পেয়েছিলাম। তার নূরাণী চেহারার প্রতিটি ভাবরেখা, তার ঘর-বাহিরের বিভিন্ন গতিবিধি ও আচরণধারা এবং তার ভিতরের অন্তর্জালা বারবার আমি দেখেছি, শুনেছি এবং কাছ থেকে অনুভব করেছি। কপালে যাদের এ সৌভাগ্য জুটেনি তারা সজাগ অনুভূতি ও উপলব্ধির সাথে এই বইটি পড়ুন; এ সব ক'টি বিষয় আপনার সামনে বেশ পরিস্ফুট হবে। সেই সাথে দাওয়াতের উসূল ও কর্মপন্থা এবং দাওয়াতের হাকীকত ও সারবত্তা পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম হবে।

ওয়ালিউল্লাহী খান্দানঃ

শেষ যুগের মুসলিম ভারতে হযরত শাহ্ ওয়ালিউল্লাহী রহঃ – এর খান্দানকে আল্লাহ্ তায়ালা এতদঞ্চলের 'মেরুকেন্দ্রের' মর্যাদা দান করেছিলেন। সুতরাং ভারতবর্ষে তৈমুর বংশীয় শাসকদের ভ্রান্ত শাসনে ইসলামের যে ক্ষতিসাধন হয়েছিল তার ক্ষতিপূরণ ও সংশোধনের সুমহান দায়িত্ব এ ভাগ্যবান পরিবারের উলামা মাশায়েখ ও তাদের অনুগামীদের হাতেই অর্পিত হয়েছিল। সে ধারাবাহিকতা আজ পর্যন্ত অক্ষুন্ন রয়েছে। আজকের এ দাওয়াতি মেহনতের প্রবর্তক পুরুষ – মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস রহঃ এ 'স্বর্ণসূত্রের' সাথেই সম্পৃক্ত।

আমাদের আলোচিত ব্যক্তিত্ব মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস রহঃ – এর প্রমাতামহ মাওলানা মুযাফফর হোসাইন সাহেব ছিলেন হযরত শাহ মুহাম্মদ ইসহাক রহঃ – এর প্রিয়তম ছাত্র এবং হযরত শাহ মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব রহঃ – এর বিশিষ্ট শিষ্য ও খলিফা। অন্যদিকে মাওলানা মুযাফফর সাহেব রহঃ – এর আপন চাচা মুফতী ইলাহী বখশ রহঃ ছিলেন হযরত শাহ আযীয রহঃ – এর বিশিষ্ট ছাত্র ও নিবেদিত প্রাণ শিষ্য। পরবর্তীতে তিনি আপন শায়খ হযরত শাহ আযীয রহঃ – এর খলীফা হযরত আহমদ শহীদ রহঃ – এর হাতে বাইআত হন। চাচা-ভাতিজা উভয়ে ছিলেন সমকালের স্বনামধন্য মুফতী ও শিক্ষক। তাদের তাকওয়া পরহেযগারী ও ধার্মিকতার পূর্ণ প্রভাব খান্দানের অধিকাংশ সদস্যের জীবন ও চরিত্রে বিস্তার লাভ করেছিল, যার বিশদ বিবরণ সংশ্লিষ্ট জীবনী গ্রন্থে পাওয়া যাবে।

হযরত মাওলানার আব্বা ও দু'ভাই ছিলেন উচু স্তরের ধার্মিক পুরুষ ও আধ্যাত্মিক বুযুর্গ। তার আব্বাই হলেন প্রথম ব্যক্তি যার সাথে মেওয়াতীদের আন্তরিক ভালবাসা ও হৃদয়-সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। পরবর্তীতে তার বড় ভাই মাওলানা মুহাম্মদ সাহেব রহঃ ক্ষুধা–অনাহার ও 'আল্লাহ্ ভরসা'র পাথেয় সম্বল করে মরহুম পিতার আধ্যাত্মিক মসনদে আসীন হয়েছিলেন। হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস রহঃ হলেন এ সিলসিলার তৃতীয় পুরুষ।

সমকালীন তাবলীগী মেহনতের ব্যর্থতা ও কারণঃ

ইংরেজী **১৯২১** সনের পূর্বাপর সময়ের কথা। ভারতবর্ষে আর্য সমাজীয় 'শুদ্ধি আন্দোলনের' প্রভাবে দেহাতি অঞ্চলের অশিক্ষিত নওমুসলিম সমাজে ধর্মত্যাগের এক দাবানল ছড়িয়ে পড়ল। হঠাৎ জ্বলে উঠা এ দাবানল নিভিয়ে ভারতীয় মুসলমানদের ভবিষ্যত অস্তিত্ব নিরাপদ করার উদ্বেগ-আকুলতায় মুসলিম সমাজে স্বভাবতই সাজসাজ রব পড়ে গেল। বহু তাগলীগী সংস্থা ও ধর্মপ্রচার সংঘ আত্মপ্রকাশ করল। বিপুল পরিমাণ চাঁদা সংগৃহীত হল এবং সর্বত্র বেতনভুক্ত মুবাল্লিগ ছড়িয়ে দেয়া হল। মুসলিম যুক্তিবাদী ও তর্কবাগীশগণ বাহাস বিতর্কের ঝড় তুলে ময়দান গরম করলেন। বছর কয়েক এ সকল কর্মকান্ড বেশ ধুমধামের সাথেই চলতে লাগল। কিন্তু ধীরে ধীরে এক সময় ধর্ম রক্ষার জোশ-জযবা স্তিমিত হয়ে এল এবং প্রাচার সংস্থাগুলো একে একে বিলুপ্ত হতে লাগল। অর্থ সংকট ও চাদা-স্বল্পতার কারণে মুবাল্লিগগণ চাকুরীচ্যূত হতে থাকলেন। বাহাস বিতর্কের জন্য যুক্তিবাদী আলিমদের দাওয়াত ও চাহিদা হ্রাস পেতে লাগলো। এভাবে একসময় অশান্ত সমুদ্র বিলকুল শান্ত হয়ে গেল। কিন্তু কেন এ নিদারুণ ব্যর্থতা **?** কি এর কারণ **?-** কারণ এই যে, এ সব হুলস্থুল কর্মকান্ড, কর্মী পুরুষদের আত্মনিমগ্নতা ও হৃদয় নিবিষ্টতার ফসল ছিল না। দাঈ ও মুবাল্লিগদের অন্তরেও ছিলনা দ্বীনী ও দ্বীনী দাওয়াতের প্রতি বিশেষ কোন আকর্ষণ। বরং সবকিছুর মূলে ছিল মারহাবা ও জিন্দাবাদের মোহ এবং স্থূল মুনাফার লোভ-লালসা। অথচ দাওয়াত ও তাবলীগের আবেগ জযবা এবং আধ্যাত্মিক দীক্ষা দানের মেহনত মুজাহাদা তো বাজার দরে খরিদ করার জিনিস নয়। এটা তো প্রবল ধারায় উৎসারিত হয় আল্লাহ্তে সমর্পিত হৃদয়ের অন্তসলীলা থেকে।

দাওয়াত ও তাবলীগের নববী নীতি

প্রথম মূলনীতি- আম্বিয়া কেরামের দাওয়াত ও তাবলীগ এবং মেহনত ও মুজাহাদার মূল বুনিয়াদই এই যে, আপন শ্রম ও পরিশ্রমের দান ও প্রতিদান কোন মাখলুকের কাছে তারা আশা করেন না।

এ দাওয়াতি মেহনতের কোন বিনিময় তোমাদের কাছে আমি চাই না। আমার প্রতিদান তো দেবেন আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন। - সূরা আশ শুআরা, আয়াত ১০৯।

এটাই হলো তাদের সকলের সর্বকালের সার্বজনীন সিদ্ধান্ত ও ঘোষণা। এমন কি আপন কাজের কোন স্বীকৃতি ও প্রশংসাও তারা কামনা করেন না কোন বান্দার কাছে। যুগে যুগে নববী দাওয়াতের সর্বব্যাপী আকর্ষণ ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রভাবের উৎস হলো দু'টি শক্তি।

- মাখলুকের যে কোন দান প্রতিদানের প্রতি তাদের পূর্ণ বিমুখতা এবং
- তাদের জীবন ও চরিত্রের চিরপবিত্রতা।

সূরা ইয়াসীনে সত্যের প্রতি আহ্বানকারী কতিপয় দা'ঈর মর্মস্পর্শী বিবরণ এসেছে। প্রথম দা'ঈকে প্রত্যাখানের পর তার সমর্থনে পরবর্তী দা'ঈর আগমন হলো। অবশেষে শহরপ্রান্ত থেকে এক সৌভাগ্যবান মানবের আবির্ভাব হল। দরদী মনের সবটুকু আকুতি ঢেলে দিয়ে স্বজাতির উদ্দেশ্যে মর্মস্পর্শী আহ্বান জানিয়ে তিনি বললেন-
হে আমার জাতি! রাসূলগণের অনুসরণ কর। তাদের কথা মেনে নাও যারা তোমাদের কাছে কোন বিনিময় চায় না। তদুপরি তারা সত্য পথের পথিক। - সূরা ইয়াসিন, আয়াত ২০-২১।

সুতরাং বোঝা গেল; জীবন ও চরিত্রের শুচি-শুভ্রতা, আল্লাহ্‌র প্রতি একান্ত অনুরাগ এবং জাগতিক চাওয়া-পাওয়ার প্রতি পূর্ণ বিরাগই হচ্ছে দা'ঈ ও মুবাল্লিগের আকর্ষণীয়তা ও সফলতার মূল উৎস।

দ্বিতীয় মূলনীতি- আম্বিয়া কেরামের দাওয়াত ও তাবলীগের দ্বিতীয় চালিকা শক্তি হল মানব প্রেম ও মানব কল্যাণের আকুতি। পথহারা মানুষের বরবাদি-আশংকায় হৃদয় তাদের যন্ত্রণাদগ্ধ হয়। এ শুভচিন্তায় ব্যাগ্র-ব্যাকুল হয় যে, কোনভাবে যদি মানুষের সংশোধন হতো! যদি তাদের এ ধ্বংসযাত্রা মুক্তিযাত্রায় মোড় নিত! নিছক পিতৃস্নেহের টানে বাপ যেমন সন্তানের কল্যাণকামী ও সংশোধন প্রয়াসী হয় ঠিক সেই অনুভূতি ও প্ররণা এবং ভাব ও চেতনা ক্রিয়াশীল হবে দা'ঈ ও উম্মতের মুবাল্লিগের অন্তরে। মানুষের কল্যাণ চিন্তায় একটা অস্থির যন্ত্রণা অনুভূত হবে তাদের দরদী হৃদয়ে। স্বজাতির উদ্দেশ্যে হযরত হুদ (আঃ) বলেছেন-
হে আমার জাতি! আমি নির্বোধ নই। আমি তো রাব্বুল আলামীনের প্রেরিত রাসূল। আপন প্রতিপালাকের বাণী তোমাদের কাছে আমি পৌঁছে দিচ্ছি। আমি তোমাদের কল্যাণকামী, বিশ্বস্ত।– সূরা আরাফ, আয়াত ৬৭-৬৮।

হযরত সালিহ (আঃ) তার উম্মতকে সম্বোধন করে মর্মজ্বালা প্রকাশ করেছেন এভাবে- **হে আমার জাতি! আপন প্রতিপালাকের পয়গাম আমি তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি। কিন্তু (কি করবো) তোমরা তো আপন কল্যাণকামীদের পছন্দ করো না।**– সূরা আরাফ, আয়াত ৭৯

কওম হযরত নূহ (আঃ) এর প্রতি গোমরাহী ও ভ্রান্তির অপবাদ করল আর তিনি প্রতি প্রতিবাদ করে বললেন- **হে আমার কওম! আমি বিভ্রান্ত নই। আমি তো রাব্বুল আলামীনের প্রেরিত রাসূল। আপন প্রতিপালাকের পয়গাম আমি তোমাদের কাছে পৌঁছে দেই আর আমি তোমাদের মঙ্গল চাই।**– সূরা আরাফ, আয়াত ৬২।

রাসুলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াতি মনোভাব ও তাবলীগের অবস্থা আল কুরআন বারবার আলোচনা করেছে এবং প্রতিবারই এটা সুপরিস্ফুট হয়েছে যে, উম্মতের প্রতি কি অপরিসীম দরদ-ব্যথা ছিল তার পবিত্র হৃদয়ে। এমন ব্যথা যার কঠিন নিষ্পেষণে পিঠের হাড় পর্যন্ত গুলিয়ে যায়।

আমি কি তোমার বক্ষ উম্মুক্ত করিনি এবং তোমার উপর থেকে সে বোঝা সরিয়ে দেইনি যা তোমার পিঠ ভেঙ্গে দিয়েছিল।– সূরা আল ইনশিরাহ্‌, আয়াত ১-৩।

উম্মতের দরদ ব্যথায় ও চিন্তা ব্যাকুলতায় তিনি এমন বিপর্যস্ত ছিলেন যে, বেঁচে থাকাও তার কাছে কষ্টকর মনে হচ্ছিল। তাই আল্লাহ্‌ তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন-

তারা ঈমান আনছে না বলে আপনি বুঝি প্রাণ বিসর্জন দিবেন। সূরা শুআরা, আয়াত ৩।

একই বক্তব্য এসেছে সূরাতুল কাহাফের এক আয়াতে-

তারা যদি ঈমান না আনে তাহলে আপনি আফসোস করে তাদের পিছনে জান দিবেন। সূরা কাহাফ, আয়াত ৬।
এমন দয়ামায়া ও ভালবাসার কারণেই উম্মতের যে কোন কষ্ট তার কাছে ছিল অসহনীয়। মনে প্রাণে তিনি চাইতেন, সকল খায়র বরকতের দুয়ার যেন তাদের জন্য যেন খুলে যায়। রাসূলের এই চির কল্যাণকামী পবিত্র রূপটিই তুলে ধরা হয়েছে আল কুরআনের এই আয়াতে-

তোমাদের কাছে তোমাদেরই মধ্য হতে এক রাসূল আবির্ভূত হয়েছেন, যার কাছে তোমাদের যেকোন কষ্ট অসহনীয়, তোমাদের মঙ্গল কামনায় যিনি ব্যাকুল, মুমিনদের প্রতি যিনি দয়াবান, মেহেরবান।– সূরা আত-তওবা, আয়াত ১২৮।

তৃতীয় মূলনীতি- দাওয়াত ও তাবলীগের তৃতীয় মূলনীতি হল সহজ-সরল ও সুকোমল আচরণ এবং আন্তরিক ও প্রজ্ঞাপূর্ণ সম্ভাষণ যাতে শ্রোতা দা’ঈর ইখলাছ, আন্তরিকতায় ও সহৃদয়তায় বিমুগ্ধ হয় এবং ভালবাসার উত্তাপে তার হৃদয় মোমের মত গলে যায়। ফলে প্রতিটি বক্তব্য ও আবেদন মর্মমূলে প্রবেশ করে একটি অস্থির আলোড়ন তুলে। ফিরআউনের মত রবের দাবীদার কাফিরের কাছে হযরত মুসা (আঃ)-এর মত মহান মর্যাদার অধিকারী নবীকে যখন পাঠানো হল তখন এ উপদেশই দেয়া হল-

তোমরা উভয়ে তার সাথে নরম কথা বলবে। সূরা ত্বা-হা, আয়াত ৪৪।

যেকোন মূল্যে ইসলামের ক্ষতি সাধন ও শিকড় কর্তনের অপচেষ্টায় মদীনার মুনাফিকরা কেমন আদাজল খেয়ে মাঠে নেমেছিল এবং ইসলামী দাওয়াত ও মুহাম্মদী রিসালাতকে ব্যর্থ করার অপতৎপরতায় কেমন নগ্নভাবে মেতে উঠেছিল তা তো সবারই জানার কথা। কিন্তু তারপরও আল্লাহ্ তার রাসূলকে নির্দেশ দিচ্ছেন- আপনি তাদের প্রতি ক্ষমাসুন্দর হোন, তাদেরকে উপদেশ দান করুন এবং তাদের বিষয়ে তাদেরকে মর্মস্পর্শী কথা বলুন।

মুনাফিকদের সাথেই যখন এমন কোমল আচরণ ও হৃদয়গ্রাহী সম্ভাষণ অবলম্বনের আদেশ করা হচ্ছে তখন সহজেই বুঝা যায় যে, সরল ও অবুঝ আম মুসলমানদের প্রতি দা’ঈ ও মুবাল্লিগদের অনুভূতি ও মনোভাব কেমন হওয়া উচিত? এবং তাদেরকে দ্বীন বুঝানোর দাওয়াতি পন্থা কেমন হওয়া উচিত? একারণেই আল্লাহ্ তায়ালা অবশ্যপালনীয় এ দাওয়াতি মূলিনীতি নীচের আয়াতে বিশদভাবে তুলে ধরেছেন। ইরশাদ হয়েছে-

আপন প্রতিপালকের পথে প্রজ্ঞা ও উত্তম উপদেশ দ্বারা আহবান করুন এবং (প্রয়োজনে) তাদের সাথে সর্বোত্তম উপায়ে বিতর্ক করুন। সূরা নাহল, আয়াত ১২৫।

ইসলামের দা’ঈরূপে দু’জন সাহাবীকে যখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়ামেনের দিকে পাঠালেন তখন যাত্রা লগ্নে তাদের প্রতি তার উপদেশ ছিল এই-

সহজ করো; কঠিন করো না এবং সুসংবাদ দাও; নিরুৎসাহিত করো না। *-সহীহ বুখারী, Volume 008, book 73, hadith 146*

শুনতে যদিও দু’শব্দের সাদামাটা দু’টি বাক্যমাত্র কিন্তু এ নববী ইরশাদ দাওয়াত ও তাবলীগের কর্মপন্থার এক পূর্ণাঙ্গ দর্শন ও রূপরেখা ধারন করেছে। অর্থাৎ দাওয়াতের ক্ষেত্রে দা’ঈ ও মুবাল্লিগদের কর্তব্য হল প্রারম্ভিক স্তরে-

- কঠোরতার পরিবর্তে মানুষের সামনে দ্বীন ও শরীয়তের সহজ থেকে সহজ রূপ ও স্বরূপ তুলে ধরা।
- জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া।
- আমলের সওয়াব ও ফজীলতের কথা বলা।
- আল্লাহ্র রহমত ও মাগফিরাতের ব্যাপ্তি আলোচনা করা।

এভাবে তাদেরকে দ্বীনের পথে চলার হিম্মত ও সাহস যোগানো। অবশ্য এর অর্থ মৌল আকীদা বিশ্বাস ও ফরয ওয়াজিবের ক্ষেত্রে তোষণ ও শৈথিল্য প্রদর্শন মোটেই নয়। কেননা শরীয়তে কোন অবস্থাতেই এর বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। বরং আচরণে কোমলতা ও কর্মপন্থায় নমনীয়তা অবলম্বনই হল আমাদের বক্তব্যের উদ্দেশ্য। ফরয-ওয়াজিব বাদে বিভিন্ন ফরযে কিফায়া ও সুন্নতের ক্ষেত্রে কিংবা কোন রকম ফিতনার আশংকা নেই এমন সব ক্ষেত্রে (শুরুতে)বেশী কঠোরতা সংগত নয়। তদ্রুপ ইমাম মুজতাহিদদের মতভিন্নতার ক্ষেত্রে সকলকে একটি মাত্র মত গ্রহণের জন্য চাপ প্রয়োগ করা উচিত নয়। এইভাবে মাসায়েলের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তায়ালা প্রদত্ত 'অবকাশকে' উচ্চতম তাকওয়া ও সংযমের জন্য সংকীর্ণ করা উচিত নয়।
সীরাত ও হাদীস গ্রন্থে এ ধরণের বহু উদাহরণ পাওয়া যায়। আকায়েদ ও ফরয আহকামের ক্ষেত্রেই শুধু আল কুরআনের নমনীয়তা ও তোষণনীতি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যেমন আকাইদের ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ নমনীয়তার আবদার ছিল কাফিরদের – *ওরা চায় আপনি কিছুটা নমনীয় হোন, তাহলেও ওরাও নমনীয় হবে।* কিন্তু সে অনুমতি আল্লাহর রাসূলকে দেয়া হয় নি।

চতুর্থ মূলনীতি- এ মূলনীতির অনিবার্য দাবী হল দাওয়াত ও তাবলীগের ক্ষেত্রে ক্রম গুরুত্বপূর্ণতার বিষয়টি বিবেচনায় রাখা। (অর্থাৎ প্রথমে গুরুত্বপূর্ণতম বিষয়টির দাওয়াত পেশ করতে হবে। তারপর দ্বিতীয় গুরুত্বপুর্ণতম বিষয়টি পেশ করতে হবে। এভাবে ক্রমান্বয়ে।) এ কারণেই দাওয়াত ও তাবলীগের শুরুতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওহীদ ও রিসালাতের উপরই শুধু জোর দিয়েছেন। তাওহীদী কালিমা – লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই)দ্বারাই শুরু হয়েছিল তার দাওয়াত। *"আমাদের কাছে আপনার কি দাবী? কুরাইশের এ জিজ্ঞাসার জবাবে তিনি বলেছিলেন, (আমার দাবী) একটি মাত্র কালিমা, একটি মাত্র কথা। যদি তোমরা তা মেনে নাও তাহলে আরব আজম সব তোমাদের অনুগত হবে। শুধু বল- আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল।* - আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়া, হায়াতুস সাহাবাহ-১ম খন্ড,পৃষ্ঠা ৫৮।

বস্তুত আল্লাহর একত্ব এবং রাসূলের আনুগত্য তথা তাওহীদ ও রিসালাতই হচ্ছে সেই সারগর্ভ বীজ যাতে সুপ্ত রয়েছে যাবতীয় আহকাম ও বিধানের ফুলে-ফলে সমৃদ্ধ বিরাট বৃক্ষ। সুতরাং মানব হৃদয়ের উর্বর মাটিতে তাওহীদ ও রিসালাতের বীজ বপন করা উচিত সর্বাগ্রে। তারপর পর্যায়ক্রমে আসবে আহকাম ও বিধানের প্রসঙ্গ।

স্বয়ং আল কুরআনের অবতরণ পদ্ধতিও এই দাওয়াতি মূলনীতি ও কর্মপন্থার উৎকৃষ্ট নমুনা। হযরাত আয়েশা রাঃ বলেন, প্রথম দিকে আল কুরআনে জান্নাত-জাহান্নাম ও তারগীব-তারহীব সম্বলিত মন নরমকারী আয়াতই শুধু নাযিল হয়েছে। পরবর্তীতে মানুষ যখন ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হল তখন হালাল হারাম সম্বলিত আয়াত সমূহ নাজিল হয়েছে। কিন্তু প্রথমেই যদি মদ হারামের আয়াত নাজিল হত তাহলে কে মানত তা? - এ হাদীস থেকে জানা বুঝা গেল যে, কুরআন অবতরণের ক্ষেত্রেও তাবলীগের পর্যায়ক্রম নীতি অনুসৃত হয়েছে।

তায়েফের প্রতিনিধি দল নবজীর দরবারে হাজির হল এবং ইসলাম গ্রহণের জন্য তাদের নামায মওকুফ করার শর্ত পেশ করল। কিন্তু যে ধর্ম গ্রহণে আল্লাহর সামনে অবনত হওয়ার জযবা নেই, তা কি কাজে আসবে? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করলেন- *নামাযবিহীন ধর্ম কল্যাণবিহীন।* এরপর তারা তাদের ওশর মাফ করার এবং মুজাহিদীন ফৌজে বাধ্যতামূলক ভর্তি হতে অব্যাহতি দানের শর্ত পেশ করল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শর্ত দুটো কবুল করে নিয়ে বললেন, মুসলমান হয়ে যাওয়ার পর এরা স্বেচ্ছায় ওশরও দিবে এবং জিহাদেও শরীক হবে।

মুহাদ্দিসগণ লিখেছেন যে, নামায যেহেতু প্রতিদিন পাঁচবার সার্বক্ষণিক ফরয সেহেতু তাতে শিথিলতা করা হয় নি। পক্ষান্তরে জিহাদে অংশগ্রহণ যেহেতু ফরজুল কিফায়া। তদুপরি সময় ও পরিস্থিতি সাপেক্ষ। তদ্রুপ ওশর ও যাকাতের ফরজিয়ত যেহেতু এক বছরের অবকাশপূর্ণ, তদুপরি বিলম্বে আদায়যোগ্য সেহেতু এ দুটি ক্ষেত্রে নমনীয়তা দেখানো হয়েছে। এভাবে এখানে দাওয়াত ও তাবলীগের প্রজ্ঞাপুর্ণ নীতি ও মূলনীতি সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

হযরত মুয়ায বিন জাবাল রাঃ কে ইয়েমেনে পাঠানোর সময় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, **তুমি যেখানো যাচ্ছ সেখানে কিতাবীরাও বাস করে। সেখানে গিয়ে প্রথমে তাদেরকে তুমি "আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসুল" – এ দাওয়াত দিবে। যদি তারা তা কবুল করে তাহলে তাদেরকে বলবে যে, আল্লাহ তাদের**

উপর দিনে পাচঁ ওয়াক্ত নামায ফরজ করেছেন। এটাও যদি তারা মেনে নেয় তাহলে তাদেরকে বলবে যে, আল্লাহ তোমাদের উপর যাকাত ফরজ করেছেন যা ধনী সমাজ থেকে উসূল করে গরীব সমাজে বিতরণ করা হবে। এ আদেশ যদি তারা মেনে নেয়, তাহলে বেছে বেছে তাদের উৎকৃষ্ট সম্পদ গ্রহণ করবে না। আর মজলুমের আহাজারি থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবে। কেননা মজলুমের আহাজারি ও আল্লাহর মাঝে কোন আড়াল নেই (সরাসরি তা আল্লাহর আরশে পৌঁছে যায়)। - *সহীহ বুখারী, Volume 002, book 24, hadith 573*

পঞ্চম মূলনীতি- রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবন-চরিতে দাওয়াত ও তাবলীগের যেসব মূলনীতি বিশিষ্টতা লাভ করেছে তারমধ্যে একটি হল, 'দাওয়াত নিবেদন'। অর্থাৎ মানুষের আগমন প্রতিক্ষায় বসে না থেকে তিনি ও তার প্রেরিত দূতগণ দূরদূরান্তের লোকালয়ে মানুষের দুয়ারে হাজির হতেন এবং সত্যের দাওয়াত পেশ করতেন। এভাবেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা থেকে সেই 'পাথর খাওয়া' তায়েফে সফর করেছেন এবং নেতৃত্বস্থানীয়দের ঘরে ঘরে তাবলীগ করেছেন। হজ্জ মৌসুমে আগত প্রতিটি গোত্রের কাফেলায় গিয়ে হাজির হয়েছেন এবং মানুষের উপহাস পরিহাস উপেক্ষা করে তাদের সামনে হক্বের পয়গাম তুলে ধরেছেন। মানুষের সন্ধানে মানুষের দুয়ারে ধরনা দেয়ার এ নববী কুরবানির পথ ধরেই এক সময় সেই মহাভাগ্যবান ইয়াসরাবীদের (ইয়াসরাব বা মদীনার অধিবাসী) দেখা পাওয়া গেল, যাদের মাধ্যমে 'ঈমান-সম্পদ' মক্কা হতে মদীনায় স্থানান্তরিত হল।

হুদায়বিয়ার সন্ধির পরে শান্তি ও স্বস্তিকালীন সময়ের সুযোগে মুসলিম দূতগণ ইসলামের বার্তা নিয়ে মিশর, ইরান ও হাবশার রাজদরবারে পৌঁছেছিলেন এবং ওমান, ইয়ামান, বাহরাইন ও সিরীয় সীমান্তের সরদারদের মজলিসে হাজির হয়েছিলেন। তাছাড়া বিভিন্ন সাহাবী আরবের বিভিন্ন অঞ্চল ও গোত্রে গিয়ে ইসলামের তাবলীগ করেছেন। হযরত মুসআব বিন ওমায়ের রাঃ গিয়েছেন মদীনায় এবং হযরত আলী ও মুয়ায বিন জাবাল রাঃ গমন করেছেন ইয়ামান অভিমূখে। যুগে যুগে দেশে দেশে ওলামায়ে হক্ব ও আইম্মায়ে দ্বীনের এটাই ছিল অনুসৃত পন্থা। সুতরাং এটা পরিষ্কার যে, হকের পয়গাম পৌঁছানোর জন্য আল্লাহর বান্দাদের দুয়ারে গিয়ে হাজির হওয়া দাঈ ও মুবাল্লিগের নিজস্ব কর্তব্য।

খানকাহর স্থির বাসিন্দাদের বর্তমান আচরণ থেকে কেউ কেউ মনে করে যে, হকপন্থী এই সাধক পুরুষদের কর্মনীতি সবসময় বুঝি এমনই ছিল। এ ধারণা আগাগোড়া ভুল। তাদের জীবনী পড়ে দেখুন; কোথাকার বাসিন্দা ছিলেন তারা? কোথায় আধ্যাত্মিক ফয়েয লাভ করেছেন? তারপর কোথায় কোথায় গিয়ে সত্যের আলো ও হিদায়েতের নূর ছড়িয়েছেন? আর শেষ বিশ্রামের জন্য কোথায় গিয়ে মাটির আশ্রয় পেয়েছেন? এই 'সফরি জিহাদ' তারা এমন এক সময় করেছিলেন যখন আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার কোন অস্তিত্ব ছিল না। রেল-বিমানের গতিও ছিল না মানুষের কল্পনায়। তাই 'ছোট হয়ে আসছে পৃথিবী' বলার মত গর্ব ছিল না তাদের। আজমীরের হযরত মাঈনুদ্দীন চিশতী রাহঃ এর জন্ম সীস্তানে (আফগানিস্তানের চিশ্‌ত অঞ্চলে)। আধ্যাত্মিক সাধনা আফগানিস্তানে। আর সত্য প্রচার করেছেন রাজপুতানের কুফুরস্তানে। হযরত ফরীদ শোকরগঞ্জ রাহঃ সিন্ধুর উপকূল পথে দিল্লী হতে পাঞ্জাব চলাচল করেছেন। তার শিষ্য উপশিষ্যদের মধ্যে সুলতানুল আওলিয়া হযরত নিযামুদ্দীন রহঃ এর এবং পরবর্তীতে তার খলিফাদের জীবন-কথা পড়ুন। সফরের পথ পরিক্রমা লক্ষ করুন। আর মানচিত্র খুলে দেখুন, কোন দূর দূরান্তে ছড়িয়ে আছে তাদের কবর। কেউ দাক্ষিণাত্যে, কেউ মালয়ে, কেউ বাংলাদেশের দূর পাড়া গাঁয়ে। কেউ বা যুক্তপ্রদেশের অখ্যাত কোন এলাকায়।

ষষ্ঠ মূলনীতি- ইসলামী দাওয়াত ও তাবলীগের আর একটি বড় মূলনীতি হল অভিযাত্রা। অর্থাৎ দ্বীনের সন্ধানে স্বদেশ স্বজন ছেড়ে বের হয়ে পড়া এবং যেখানে দ্বীন হাসিল করা সম্ভব সেখানে গিয়ে হাজির হওয়া। আবার ফিরে এসে স্বজাতির মাঝে দ্বীনের ফয়য বিস্তার করা। সূরা নিসার নিম্নোক্ত আয়াত শানে নূযুল- এর বিচারে যুদ্ধ ও জিহাদ বিষয়ক হলেও শব্দের ভাব ব্যাবপকতার বিচারে যে কোন কল্যাণ অভিযাত্রাই এর অন্তর্ভুক্ত। কাযী বায়যাবী রাহঃও তার তাফসীর গ্রন্থে সে ইংগিত করেছেন।
হে ঈমানদারগণ! নিজেদের হিফাযত ও নিরাপত্তার আয়োজন কর এবং আলাদা আলাদা অথবা দলবদ্ধভাবে ঘর থেকে বের হও। সূরা আন নিসা, আয়াত ৭১।
সূরা তওবায় তো বিশষভাবে এ বিষয়েই একটি আয়াত রয়েছে।
সব মুসলমান ঘর ছেড়ে বের হবে তা তো সম্ভব নয়। তবে সবদল থেকে একটা উপদল কেন এ উদ্দেশ্যে ঘর ছেড়ে বের হয় না যে, তারা দ্বীনের সমঝ লাভ করবে। আর যখন স্বজাতির মাঝে ফিরে আসবে তখন তাদেরকে সতর্ক করবে যাতে তারাও মন্দ কাজ পরিহার করে চলে। সূরা তওবা, আয়াত ১২২।

নববী যুগে এভাবেই বিভিন্ন গোত্র থেকে প্রতিনিধি দল আকারে মানুষ মদীনা মুনাওয়ারায় আসতো এবং দশ বিশ দিন মদীনায় থেকে দ্বীনের ইলম ও আমাল হাসিল করে নিজ নিজ এলাকায় ফিরে যেত এবং অবশিষ্টদের দ্বীন শেখানোর দায়িত্ব আঞ্জাম দিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মুবারক যুগে মসজিদে নববীর চত্বরে ছিল আসহাবে ছুফফার অবস্থান, যাদের ঘরবাড়ী সহায় সম্পদ কিছুই ছিল না। বনে কাঠ সংগ্রহ করে বাজারে বিক্রি করাই ছিল তাদের দিবসের জীবিকা অন্বেষণ। তারপর নীরব নিশিতে চলতো শিক্ষকের খিদমতে দ্বীন অন্বেষণ। আবার প্রয়োজনে বিভিন্ন এলাকায় তালীম তাবলীগের কাজেও প্রেরিত হতেন তারা। এভাবে জীবন ব্যস্ততার মাঝেও দ্বীন শিক্ষা, নববী সান্নিধ্য লাভ এবং ইবাদতে আত্মনিয়োগ – এই ছিল তাদের জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

আসহাবে ছুফফার জীবনধারা থেকে বুঝা যায় যে, এ ধরনের জামাআত তৈরি রাখাও উম্মাহর সমষ্টিগত দায়িত্ববিশেষ। আরো জানা গেল যে, এই জামাআত বিশেষ তারবিয়ত দ্বারা তৈরি হত এবং নববী সোহবতের জাহিরী ও বাতিনী বরকত লাভে ধন্য হত এবং দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে আত্মনিয়োগ করত। প্রধানতঃ সান্নিধ্যপরশ, মৌখিক শিক্ষা, আহকাম ও মাসায়িল আলোচনা এবং পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ ও আদান প্রদানই ছিল তালীম ও শিক্ষার পদ্ধতি। তাদের রাত হত ইবাদত জাগরণে জীবন্ত আর দিন হত দ্বীনি কর্মে মুখরিত।

সর্বাধিক মূলানুগ দাওয়াত এটিঃ

এ পর্যন্ত দাওয়াত ও তাবলীগের নীতি ও মূলনীতি সম্পর্কে যা কিছু বলা হল তাতে আশা করি ইসলামের তাবলীগি দর্শন ও দাওয়াতি পদ্ধতি সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ও পূর্ণাংগ ধারণা আপনার সামনে ফুটে উঠেছে। এবার আমরা যদ্দুর বুঝি তাতে পূর্ণ আস্থার সাথে আমরা বলতে পারি যে, আগামী আলোচনায় দাওয়াত ও তাবলীগের যে তত্ত্বগত ও কর্মগত মূলনীতি ও পরিচিতি তুলে ধরা হয়েছে তা সমকালীন ভারতের সকল দ্বীনী আন্দোলনের তুলনায় মূল উৎস তথা সুন্নাতে রাসূলের অধিক নিকটবর্তী।

তাবলীগ ও দাওয়াতের গুরুত্বঃ

হিকমতপূর্ণ দাওয়াত ও তাবলীগ তথা আমর বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুনকার হল ইসলামের মেরুদন্ড। ইসলামের ভিত্তি, শক্তি, ব্যাপ্তি ও অগ্রগতি সবকিছু এরই উপর নির্ভরশীল এবং অতীতের যেকোন সময়ের তুলনায় আজ এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশী। এটা অনস্বীকার্য সত্য যে, অমুসলমানকে মুসলমান করার চেয়ে নামের মুসলমানকে কামের মুসলমান বানানো এবং জাতীয় পরিচয়ের মুসলমানকে ধর্ম পরিচয়ের মুসলমান রূপে গড়ে তোলা অনেক বেশী জরুরী ও কার্যকর। মুসলিমা উম্মাহর বর্তমান দূরাবস্থা ও মর্মন্তুদ অবক্ষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে কুরআনের এ উদাত্ত আহ্বান – হে ঈমানদারগণ তোমরা ঈমান আন – (সূরা নিসা, আয়াত ১৩৬), সর্বশক্তিযোগে প্রচার করাই হল সময়ের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন। দেশে দেশে, শহরে শহরে, গ্রামে গ্রামে এবং দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে ঘুরে মুসলমানকে মুসলমান বানানোর দাওয়াতি মেহনতেই আজ আত্মনিয়োগ করতে হবে। এমন মেহনত ও মুজাহাদা এবং ত্যাগ ও কুরবানী আমাদেরকে পেশ করতে হবে যা দুনিয়ার লোকেরা দুনিয়ার তুচ্ছ মান-সম্মান ও ক্ষণস্থায়ী ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি অর্জনের জন্য করে থাকে। ত্যাগ ও কুরবানীর জজবা থেকেই মানুষের মাঝে সৃষ্টি হয় উদ্দেশ্যের পথে প্রিয় সবকিছু বিসর্জনের এবং বাধার বিন্ধাচল অতিক্রমের এক অপরাজেয় শক্তি। ত্যাগ ও কুরবানির এ পথেই আজ আমাদেরকে অগ্রসর হতে হবে সুদৃঢ় পদক্ষেপে। নিজেদের মাঝে এমন কর্মোন্মাদনা সৃষ্টি করতে হবে যা ছাড়া দ্বীন বা দুনিয়ার কোন কাজ না কখনো হয়েছে; আর না কখনো হবে।

এ যুগে দাওয়াতি মুজাহাদার এমন উম্মাদনার নমুনা যদি দেখতে চান তাহলে আসুন, মূল কিতাব শুরু করি।

--- ওয়াসসালাম,

নগণ্য সৈয়দ সোলায়মান নদভী
মে ১৯৪৭ ভূপাল